ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৬ ও ১০৭ (যুক্ত), ডিসেম্বর ২০২৫
ISSN : 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10607005

শওকত ওসমানের *জননী*: উপনিবেশিতের আখ্যান

জাহিদ হাসান সরকার*

Abstract: Shaukat Osman's novel *Janani* is treated as a narrative of the colonised population in the text under discussion. In colonial regimes, the ruler-ruled relationship is center-periphery; The British colonial rulers throughout their rule made the social structure of Bengal a controllable end through demolition and construction. In this process of destruction and construction, a small section gets a taste of perfection and nobility, but the entire Bengali nation becomes a poverty-stricken marginalized group. Azhar Khan is an endangered representative of the marginalised people of Bengal. Despite the legacy of the Mughal nobility, its present poverty stricken. His poverty and defeat are bound by the causality of colonial rule and as inviolable as destiny. Dariabibi is the central character of this novel over Azhar. She is simultaneously a colonised woman and a woman in a patriarchal and religiously controlled society. This woman is also a mother. All systems are united to trap him in a sleeping guard. A victim of patriarchal tyranny, her husband's occasional desertions endanger her. She is responsible for raising the children, but according to religious rules, she is forbidden to go out of the house. Due to religious precepts, the first husband is deprived of his wealth, property and children. In the name of cooperation in the opportunity of Daryabibi's extreme helplessness, Yakub takes Daryabibi's body as a right of enjoyment. Patriarchy and theocracy impoverished Daryabibi; But Yakub's rape has made him destitute. His final downfall was colonial ineptitude; But this system was undermined by Daryabibi by committing suicide. Daryabibi played the joint role of mother and midwife, leaving the child in the light and air of the world and chose the darkness of death herself. In this way, Daryabibi became an invincible woman and public figure in the struggle against all the evils of the world.

মুখ্যশব্দ: উপনিবেশিতা, বহুস্বর, আখ্যান, জননী, সাম্রাজ্যবাদ

* পিএইচডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নরসিংদী সরকারি মহিলা কলেজ

১.

জননী (১৯৫৮) শওকত ওসমানের (১৯১৭–১৯৯৮) প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস, যদিও রচনার ধারাক্রমে এর অবস্থান দ্বিতীয়। চল্লিশের দশকে যুদ্ধদীর্ণ সময়পটে সওগাত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে উপন্যাসটি প্রকাশিত হতে থাকে, কিন্তু ব্রিটিশ শাসনপর্বে এটি সমাপ্ত হয়নি এবং এটি গ্রন্থরূপ পায় আরও বহু পরে, ১৯৫৮ সালে। বাংলাদেশের উপন্যাস মূল্যায়নে *জননী* বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে; উপন্যাসটিকে ঘিরে বহুমাত্রিক আলোচনা বিদ্যমান। উপনিবেশিতের আখ্যান হিসেবে *জননী* উপন্যাসটির একটি পর্যালোচনা করা আমাদের বর্তমান প্রয়াস।

২.

শওকত ওসমান নিরেট বাস্তবের কথাশিল্পী; কোনো প্রকার ভাবাবেগকে তিনি প্রশ্রয় দেননি, পছন্দও করতেন না। তাঁর রচিত কথাসাহিত্য সমসাময়িক দেশকাল, সমাজের বিশ্বস্ত দর্পণ। তাঁর জীবনের পরিসীমা যে সমাজকাঠামো ও রাষ্ট্রকাঠামোতে বলয়িত হয়েছে তার বাইরের ও ভিতরের পূর্ণাঙ্গ অবয়ব– অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাকার যাবতীয় অনুষঙ্গ পূর্ণায়তনে বিধৃত হয়েছে তাঁর কথাসাহিত্যের কথামালায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখকের প্রখর জীবনবোধ, যা আপাদমস্তক ঋজুতায় সমৃদ্ধ। ব্রিটিশ উপনিবেশের নাগরিক হিসেবে তাঁর জন্ম; তিরিশোত্তর বয়সে বাস্তুপরিবর্তনের মাধ্যমে এমন একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েছেন, যে দেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শের সঙ্গে তাঁর জীবনবোধের পার্থক্য মেরুদূর। এরপর চব্বিশ বছর কাটল তথাকথিত স্বাধীন দেশের পরাধীন নাগরিক হিসেবে। জীবনের প্রৌঢ়প্রহরে এসে নতুন করে বাংলাদেশ নামের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীন দেশের নাগরিক হলেন; কিন্তু স্বাধীন দেশে পুরানো ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ববাদী শাসনের ধারাবাহিকতাই প্রত্যক্ষ করলেন। অতিমাত্রায় রাজনীতি-সচেতন কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমানের শিল্পীমানসে এসব ঘটনাপ্রবাহ প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছে, যার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় তাঁর উপন্যাস ও গল্পের পরতে পরতে। সমালোচক সনৎকুমার সাহার (২০১৭) ভাষ্যে:

> আজীবন অজস্র লিখেছেন। উপন্যাস, ছোটোগল্প, নাটক, অন্যরকম গদ্য রচনাও। কোনোটিই ফালতু নয়। ...মগজ কারো কাছে বন্ধকও দেননি। আমাদের জাতীয় জীবনে পতন ও উত্থান দুই-ই দেখেছেন। নির্লিপ্ত বসে থাকেননি। সমূহ জীবনের দায় নিজের মতো করে মিটিয়েছেন। ফাঁকির মিশেল দেননি। সাহিত্যিক সততা তাঁর কখনও টাল খায়নি।[১]

চল্লিশের দশকের সমরদীর্ণ বিশ্বপটে এবং ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতাপ্রসূ অগ্নিগর্ভ পরিপার্শ্বে আজন্ম মানবতাবাদী ও প্রগতিশীল লেখক শওকত ওসমান *জননী* উপন্যাসটি রচনা করেছেন। দৈশিক ও বৈশ্বিক রাজনীতির প্রখর উত্তাপ থেকে উপন্যাসটি মুক্ত, তবে কেবল গ্রামীণ বাংলার

এক জননীর দারিদ্র্যের করুণ বয়ান হয়ে থাকবে উপন্যাসটি, শওকত ওসমানের হাতে এমনটি হওয়া আমরা সম্ভব মনে করি না। আমাদের ভাবনার প্রাথমিক অনুমোদন দেয় উপন্যাসটির মুখবন্ধে (১৯৬১ সালে প্রকাশিত) ঔপন্যাসিকের বিবৃতি: "বৃটিশ আমলের পটভূমিকায় বিধৃত এই গ্রামকাহিনি অনেকের কাছে আজ রূপকাহিনী মনে হতে পারে। ১৯৪০ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই উপন্যাস রচনার সূত্রপাত। স্বাধীন স্বদেশে এর সমাপ্তি। কাহিনীর পটভূমি চল্লিশ বছর আগেকার।" লেখকের বিবৃতি বিশ্লেষণে কয়েকটি বিষয় আমাদের কাছে সূত্র হিসেবে ধরা দেয়– (ক) উপন্যাসটি 'রূপকাহিনী' নয়; (খ) উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট ব্রিটিশ জমানা– বিশ শতকের বিশের দশক এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর গ্রামীণ বাংলা; (গ) উপন্যাসটির রচনাকাল উত্তাল চল্লিশের দশক, সমাপ্তি স্বাধীন দেশে। ঔপন্যাসিক পরিবেশিত তথ্যগুলো আমাদের এই ভাবনায় প্রাণিত করে যে, এই উপন্যাসটি রচনার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক রাজনীতির গূঢ় প্রভাব বিদ্যমান। উপন্যাসটির অন্তরে ও অবয়বে অনুভূত হয় ঔপনিবেশিক রাজনীতির প্রচণ্ড অন্তশ্চাপ। ব্রিটিশ শোষণে-পীড়নে দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া গ্রাম বাংলার প্রান্তিক মানুষের জীবন আদল পেয়েছে এ উপন্যাসে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক মনসুর মুসার মূল্যায়ন: "উপন্যাসে পল্লীর মানুষগুলো ইতিহাসের পটে সংস্থাপিত হয়েছে। ... লেখক শুধু যে ইতিহাস-সচেতনতা দেখিয়েছেন তা নয়, ঐতিহাসিক-অর্থনৈতিক বিবর্তনের ধারার প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন।" (মনসুর, ২০০৮, পৃ. ৫৪)। উল্লিখিত ইতিহাস অনিবার্যভাবে উপনিবেশিত বাংলার দারিদ্র্য-জর্জরিত, দিশেহারা মানুষের ইতিহাস।

৩. আখ্যানের শিথিলতা *জননী* উপন্যাসের বড় ত্রুটি হিসেবে চিহ্নিত। এ বিষয়ে কয়েকজন প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

(ক) "ঘটনা বিন্যাসে পরিমিতির অভাব আছে– আজহার খাঁর অতীত ইতিহাস অপ্রয়োজনীয়। ... মাতৃত্বের গৌরবই হয়েছে সারকথা" (আকরম, ২০১০, পৃ. ১০১)।

(খ) "এ-উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের পূর্ব পুরুষের কাহিনী অপ্রয়োজনীয়, তবু কেন আনলেন? এর উপাখ্যান বেশ সরল ও সংক্ষিপ্ত, তবু কেনো এটিকে এতো দীর্ঘ করলেন? এর তিন শতাধিক পাতাকে কি দেড়শো পাতায় সংহত করা যেতো না?" (হুমায়ুন আজাদ: 'শওকত ওসমান : কথাসাহিত্যের পথিকৃৎ', সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ২০১৭, পৃ. ২৩৭)।

(গ) "শুরুতে অধুনাদরিদ্র আজহার খাঁর একদাসমৃদ্ধ পিতৃপরিচয়ের উপস্থাপনা কেন প্রয়োজন তা স্পষ্ট নয়। উত্তর-ভারত বিজয়কালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের খণ্ডযুদ্ধের আবিস্তৃত বর্ণনা এই কাহিনীনির্মাণে কোথায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, তার ইঙ্গিতও কোথাও দৃশ্যমান নয়। বাঙলা কোনওকালেই সমৃদ্ধ স্বর্গরাজ্য ছিল না, আজহারের পিতৃপুরুষদের

> অনুকাহিনী তাই ভিন্নতর কোনো অতীতের ইঙ্গিত দেয় না।" (ওয়াসিক আল আজাদ: *'জননী উপন্যাসে গ্রামজীবন এবং শওকত ওসমানের সমাজবীক্ষা'*, রফিক, ২০১৬, পৃ. ১৬০)।

উদ্ধৃতি (খ)-তে উল্লিখিত প্রশ্নটি শওকত ওসমানের প্রতি বিশিষ্ট সাহিত্যসমালোচক হুমায়ুন আজাদের, এক সাক্ষাৎকারে।[২] প্রশ্নটির উত্তরে শওকত ওসমান বলেছিলেন: "উপন্যাসের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ নিয়ে তোমার আপত্তি। ফর্মটা লুজ বা ঢিলেঢালা। কতোখানি 'টাইট' করা যেত পরীক্ষাসাপেক্ষ।" (সিরাজুল, ২০১৭, পৃ. ২৩৮)। স্পষ্টতই *জননী*-র লেখক উপন্যাসটির আখ্যানের কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার অভিযোগকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ঘটনাবিন্যাসে কার্যকারণ শৃঙ্খলার জৈবিক অন্বয়ে সমন্বিত হওয়ার বিষয়ে যে ত্রুটির কথা উপর্যুক্ত মন্তব্যসমূহে উদ্ধৃত হলো তার সমাধান করতে আমরা রুশ ভাষাতাত্ত্বিক মিখাইল বাখতিনের উপন্যাসবিবেচনার আশ্রয় নিতে পারি। উল্লেখ্য, "উপন্যাসের শিল্পরূপ সম্পর্কে বাখতিনের ছাড়া আর কারো কোনো তত্ত্ব নেই" (দেবেশ, ২০০৩, পৃ. ৪৫)। বাখতিন "ভাষায় জায়মান বহুবিচিত্র জীবনের যথার্থ আধার হিসাবে পাঠ করেছেন উপন্যাস" (আজম, ২০১৫, পৃ. ২৭)। দস্তয়েভস্কির উপন্যাসকে ভিত্তি ধরে বাখতিন তাঁর উপন্যাসের তত্ত্বজগৎ প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাখতিনের মতে, উপন্যাস "এমনই শিল্পকর্ম, যা কোনো কাঠামোতে, কোনো কাঠামোতেই, আঁটে না" (দেবেশ, ২০০৩, পৃ. ৪৮)। বাখতিন বলেন, ফর্মের কাঠামো অস্বীকারের প্রয়োজন থেকেই শিল্পরূপ হিসেবে উপন্যাসের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর উপন্যাস সম্পর্কিত আলোচনায় ঘুরেফিরে এসেছে 'ডায়ালজি' ও 'পলিফনি' শব্দ দুটো। তাঁর মতে, ধরন হিসেবে উপন্যাস 'সংলাপপ্রধান' বা ডায়ালজিক। উপন্যাসে বাখতিন সন্ধান করেন 'বহুস্বরসঙ্গতি' বা পলিফনি; আর উপন্যাসে তা আসে সংলাপবৈচিত্র্য থেকে। "দস্তয়েভস্কির উপন্যাসে এমন সব উপাদান এনে ফেলা হয় যাদের মধ্যে পরস্পরের কোনো সম্পর্ক নেই। সেই উপাদানগুলিকে নিয়ে তৈরি হয় উপন্যাসের ভিতরে সেই উপাদানগুলির বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র জগৎ। সেই বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র জগৎগুলির থাকে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র সচেতনতা। এই সচেতনতাগুলিকে কোনো দৃষ্টিকোণে বেঁধে ফেলা হয় না– তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে অথচ উপন্যাসে তাদের সমান মূল্য। কখনোই মনে হয় না লেখক একটা সচেতনতাকে অন্য সবগুলো থেকে আলাদা মূল্য দিচ্ছেন। এই সচেতনতাগুলি শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ে একটা উচ্চতর শৃঙ্খলায় বাঁধা পড়ে। এই সচেতনতাগুলির স্বাতন্ত্র্য ও পরস্পর বিচ্ছিন্নতা ও সমমূল্য থেকেই সেই উচ্চতর শৃঙ্খলা তৈরি হয়। সেই শৃঙ্খলাকেই বাখতিন বলছেন 'পলিফনিক উপন্যাসের শৃঙ্খলা' " (দেবেশ, ২০০৩, পৃ. ৫১)। বাখতিন বলেন, লেখক তাঁর প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে উপন্যাসে তাঁর বিবরণ তৈরি করেন বহুচরিত্রের বহুস্বরের অভিঘাত ঘটিয়ে। উপন্যাসে চরিত্রগুলো উঠে আসে সমাজবাস্তবতার বিচিত্র তল থেকে, ঔপন্যাসিকের বর্ণনার গুণে তারা আপন আপন স্বর ও বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়ে উপন্যাসের বৃহৎ পটে বিচরণ করে, সেই বর্ণনায়

চরিত্র ও ঘটনাগুলি আপন স্বরূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে; আর এই বিচিত্র বাস্তবের তলগুলির সন্ধিতে অবস্থান করে লেখকের নিজস্ব স্বর। এভাবে লেখকের বর্ণনার যথার্থতায় পাঠক বুঝে নিতে পারেন ঔপন্যাসিক কোন বিবরণটি তৈরি করে তুলেছেন। এটাই উপন্যাসের বহুস্বর-বিবরণ (polyphonic discourse)। এভাবেই লেখকের মধ্যস্থতায় ও সক্রিয়তায় উপন্যাস হয়ে ওঠে বহুস্বর ও বিচিত্র বাস্তবের রূপায়ণক্ষেত্র। *জননী* উপন্যাসে শওকত ওসমান অনুপুঙ্খ বর্ণনায় এঁকেছেন উনিশ শতকের প্রথম দিককার ব্রিটিশশাসিত গ্রাম বাংলার গোটা অবয়ব– গ্রামগুলির গঠন, অর্থনৈতিক বিন্যাস, গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষের দারিদ্র্য, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বিরোধ, জমিদারদের শোষণ প্রক্রিয়া, বণিকদের শঠতা, গ্রামীণ দরিদ্র জননীর অপত্য-স্নেহ, জীবন-সংগ্রাম ও তার বিপন্নতা, গ্রামীণ মানুষের বিচিত্র পেশা, উপনিবেশের অভিঘাতে গ্রামীণ জীবনের সর্বব্যাপী ভাঙন, এই ভাঙনের সিঁড়ি বেয়ে শহর গড়ে ওঠা– কোনো কিছুই বাদ পড়েনি। গ্রামীণ জীবনের বিস্তৃত বাস্তব খুঁটিনাটিসহ আশ্চর্য চলমানতায় উপন্যাসটিতে প্রতিফলিত হয়েছে। "তাঁর উপন্যাসের পটভূমি গ্রামীণ গরিব মুসলিম সমাজ। প্রতিভাবান চিত্রকরের মতো তিনি নিখুঁতভাবে ছবি এঁকেছেন বিশাল ক্যানভাসে যেখানে আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে মোটেই হালকা নয়, এমন কোনো কিছুই বাদ যায়নি" (হায়দার, ২০১৬, পৃ. ৩৫)। 'জননী'র ক্যানভাসটি অনেক বড়ো। "গ্রামের পটভূমি বা ভূমির বিস্তারের মতোই ঔপন্যাসিক তাঁর বর্ণনাকে বিস্তৃত-ব্যাপক করেছেন" (কুদরত-ই-হুদা, ২০১৬, পৃ. ৭৫)। এই বর্ণনায় কোনো অসঙ্গতি নেই, বরং বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই বর্ণনাভঙ্গিই হয়ে উঠেছে উপন্যাসটির যথার্থ আধার। আজহারের পূর্বপুরুষের ইতিহাস উপন্যাসের বাহুল্য অংশ নয়; আজহারের এই অতীত ইতিবৃত্তটুকু না থাকলে আজহার, দরিয়া, কোটালদের ট্র্যাজিক জীবনের গোড়ার কথাটি উপেক্ষিত থেকে যেত। অর্থাৎ অতীত ইতিহাসহীন কাহিনিতে কেবল আজহারদের বর্তমানের দারিদ্র্যচিত্রই উপস্থাপিত হতো, এর হেতু থাকত অজ্ঞাত, যে-হেতুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাম্রাজ্যবাদের নোংরা ও নির্মম রাজনীতি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের স্বরূপ এবং বাংলায় এ শাসনের সর্বগ্রাসী প্রভাব বুঝার জন্য উপন্যাসটিতে আজহারের পূর্বপুরুষের ইতিহাসটুকু জরুরি ছিল। আমাদের বিবেচনায় আজহারের অতীত ইতিবৃত্তটুকুই এই উপন্যাসের গ্রন্থিবিন্দু, যেখান থেকে উপন্যাসটির আখ্যান ডালপালা মেলে বিকশিত হয়েছে।

৪.

জননী উপন্যাসে আজহারের অতীত ইতিবৃত্ত আমাদেরকে ঔপনিবেশিক শাসনের সেই ইতিহাসের সমীপবর্তী করে যেখানে আছে পরদেশ দখল ও দখল-উত্তর শাসনশোষণের নিষ্ঠুর প্রক্রিয়া আর উপনিবেশি শাসন অব্যাহত রাখার জটিল কূটচাল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, নবাবী শাসনের দুর্বল ও ভঙ্গুর কাঠামোর ভেতরেই নিহিত ছিল বাংলায় ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনের পরিপ্রেক্ষিত। বাংলার নবাবীকে কেন্দ্র করে গজিয়ে উঠেছিল প্রতিহিংসা, ক্ষমতার মোহ আর অধিকতর মুনাফার লোভ। নবীন নবাবের প্রশাসনিক অনভিজ্ঞতা ও অদক্ষতার বিপরীতে চলমান

ঝানু অমাত্যবর্গ ও স্বজনদের ষড়যন্ত্র বাংলায় ব্রিটিশদের উপনিবেশ স্থাপনের সুযোগ অবারিত করে দেয়। রাজনীতির জটিল সমীকরণ নিয়ে ব্রিটিশ বণিকরা নবাব দরবারের অমাত্যদের প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে ষড়যন্ত্রকে ঘনীভূত করে তোলে। বিশেষত মীর জাফর আলী খাঁ ও জগৎশেঠের বিশ্বাসঘাতকতায় সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলার নবাব কার্যত অসহায় হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে পলাশি প্রান্তরের মুখোমুখি যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার বিরুদ্ধে অর্জিত বিজয়ের ভিতে দাঁড়িয়ে ক্রমান্বয়ে ব্রিটিশ বণিকরা বাংলায় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে। বক্সারের যুদ্ধের (১৭৬৪) মাধ্যমে ব্রিটিশ বণিকী শাসন বাংলায় দৃঢ় ভিত্তি পায়। এরপর চলে ব্রিটিশ কর্তৃক সামরিক দলনে উপনিবেশবিরোধীদের নিঃশেষ করার ভয়ানক নির্মমতা। অব্যবহিত-পূর্ব শাসকপক্ষের অংশ হিসেবে বাঙালি মুসলমানদের অধিকাংশই কখনো ভারতে 'কাফের' ইংরেজদের শাসনকে মেনে নেয়নি; বরং তারা ক্রমাগত ইংরেজদের হটানোর সশস্ত্র লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছে এবং বলাবাহুল্য, উপনিবেশক ব্রিটিশরা বরাবরই সেসব আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করেছে। নবাবী আমলের হিন্দু রাজা ও অমাত্যরাও ব্রিটিশ নৃশংসতা থেকে রেহাই পায়নি। এর অন্যতম দৃষ্টান্ত ব্রিটিশবিরোধিতার মিথ্যা অভিযোগে নন্দকুমার নামের জনৈক অভিজাত বাঙালিকে জনসমক্ষে মৃত্যুদণ্ড প্রদান। *জননী* উপন্যাসে মুসলমানদের ওহাবি আন্দোলন ও ইংরেজ কর্তৃক তা দমনের প্রসঙ্গ এসেছে। ওহাবি মতাদর্শে বিশ্বাসীদের পরিচালিত এ আন্দোলনের দুটো মুখ ছিল– প্রথমত, ইসলামের বিশুদ্ধচর্চার মাধ্যমে ইসলামকে স্খলনের হাত থেকে রক্ষা করা; দ্বিতীয়ত, ইংরেজদের হটিয়ে ভারতে মুসলমানদের শাসন পুনঃপ্রবর্তন করা। এ উপন্যাসে ওহাবি আন্দোলনের পটভূমি সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'এদেশে তখন ইংরেজের প্রতাপ ও আক্রমণ নানাদিকে প্রচণ্ডতর হইতেছে। তারই প্রতিক্রিয়ায় সুদূর কাবুল হইতে বাংলার গ্রাম-অভ্যন্তরে ওহাবি আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সেই সময়কার কাহিনী।' (শওকত, ২০১০, পৃ. ১২৪)। ওহাবিদের উগ্র মৌলবাদী আদর্শ মুসলিমসমাজে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে দেশব্যাপী ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় ব্রিটিশ শাসকরা তাদেরকে সামরিক শক্তি প্রয়োগে দমনের নীতি গ্রহণ করে। সামরিক দমনপীড়নে সাম্রাজ্য রক্ষার উগ্রপন্থার কৌশলের কথা ব্যক্ত হয়েছে *জননী*-তে: "ক্যাপ্টেন হ্যারিংটন লণ্ঠনের আলোয় চারিদিক পরীক্ষা করিতে লাগিল। হিন্দুস্থানী রণ-নীতি তার কলা-কৌশলের কাছে পর্যুদস্ত। এই বিজয়-গর্বে প্রায় চারিশত গোরা সিপাহী পরিবৃত্ত হইয়া হ্যারিংটন বলিল, জখমীদের এখানে ফাঁসি দেওয়া হউক। First lesson for the blackies. Examplary punishment। কালো চামড়াদের জন্য শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া ক্যাপ্টেন চলিয়া গেল।" (শওকত, ২০১০, পৃ. ১২৬)। আমরা লক্ষ করি, ক্যাপ্টেন হ্যারিংটনের আচরণে ফুটে ওঠে ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠত্বের ঔদ্ধত্য এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কঠোর নির্মমতা।

ইংরেজদের দমনপীড়নে ওহাবি আন্দোলন এক সময় স্তিমিত হয়ে আসে; ওহাবি মতাদর্শীরা আন্দোলন করার শক্তি হারায়, কিন্তু আদর্শটি তাদের মধ্যে টিকে থাকে পাথরের নিচে চাপা-

খাওয়া ঘাসের মতো; যার অবশিষ্ট শক্তি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সক্ষম না হলেও নিজ ধর্মের ভিন্ন মতাবলম্বীদের সঙ্গে সংঘাত চালিয়ে যেতে সক্ষম ছিল; এবং উল্লেখের দাবি রাখে, ওহাবিদের ওই অবশিষ্ট শক্তিটুকু আবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য খুবই সহায়ক হয়ে উঠেছিল। ভারতের মুসলমানরা সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন মজহাবের অনুসারী; পির, অলি-আউলিয়াদের খুব কাছ-ঘেঁষা। লা-মজহাবি ওহাবি মতাদর্শের উদ্ভবের ফলে মজহাবি মতাদর্শীদের দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে তা চরম আকার ধারণ করে। এই মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব কখনো কখনো রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে গড়িয়েছে। সাম্রাজ্য রক্ষার গরজে এই রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে ইংরেজ শাসকরা, মজহাবি মুসলিমগোষ্ঠীকে ওহাবিদের বিরুদ্ধে উসকিয়ে দিয়ে, মিথ্যার ব্যাপক প্রচারের গোয়েবলসীয় কূটকৌশলে। দারিদ্র্য ও মূর্খতায় জরাজীর্ণ মুসলমানসমাজে এই বিরোধ ঐতিহ্যের রূপ পায়, মুসলমান সম্প্রদায়ের দুই পক্ষের মধ্যে অন্তর্ঘাতের কারণে নিজেরাই হয়ে ওঠে নিজেদের শত্রু। ফলত, মুসলমানদের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব স্তিমিত হয়ে আসে, মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পায় এবং ব্রিটিশসাম্রাজ্য তুলনামূলক ঝুঁকিমুক্ত হয়। উপন্যাসের আজহার খাঁ ব্রিটিশ শাসনামলের এই অনালোকিত ইতিহাসের প্রতিনিধি হয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়, যে স্বভাবে নিরীহ, নিস্তেজ; কিন্তু 'ধর্মের নামে সে যেন জানোয়ার বনিয়া যায়', এবং অন্তঃধর্মীয় সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে।

৫.

'ইংরেজরা বণিকের জাত'– কথাটি বলেছিলেন সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। মুনাফার জন্যই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকরা ভারতে আসে এবং মুনাফার সীমাহীন লোভকে অবারিত করার তাগিদেই বাংলায় সাম্রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হয়। ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতে আর অস্ত্রের জোরে দেশটির ভূখণ্ড করায়ত্ত করার পর দখলদারিত্ব স্থায়ী ও পাকাপোক্ত করার জন্য ইংরেজরা কেবল নিজেদের অস্ত্রভাণ্ডার আর নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণকারী পুরোনো মিত্রদের ওপর ভরসা করতে পারল না। বরং তাদের অভ্যস্ত ষড়যন্ত্র থেকে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে নবাব দরবারের পুরোনো মিত্রদের দমনের নীতি গ্রহণ করে। এছাড়া মুগল আমলের বৃহৎ জমিদারদের প্রতিও তারা ছিল বিরূপ। কারণ, "মহা জমিদারগুলির সম্পদ ও সামাজিক প্রভাব এত ব্যাপক-বিশাল যে, তারা একজোট হলে সহজেই সরকারকে কাৎ করে দিতে পারে। এমনকি যুদ্ধ বাঁধলে তারা বিপক্ষীয় দলকে সমর্থন করে কোম্পানির শাসনকে উৎখাত করে দিতে পারে" (সিরাজুল, ১৯৯৯, পৃ. ১৩১)। বলাবাহুল্য, উপনিবেশি শাসনকে নিষ্কণ্টক ও গতিশীল করার লক্ষ্যে নবাবী আমলের পুরোনো অভিজাততন্ত্রকে ইংরেজরা গুঁড়িয়ে দেয়। কিন্তু উপনিবেশের বিশাল ভাঁড়ারকে একা সামাল দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না; তাই জরুরি হয়ে পড়ে দেশীয়দের মধ্য থেকে নতুন একটি অভিজাতগোষ্ঠী গড়ে তোলা। চাতুর্যের রাজনীতিতে তুখোড় খেলোয়াড় ইংরেজরা তাদের প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান সম্প্রদায় ও পুরোনো হিন্দু সামন্ত-অভিজাতদের প্রতি আস্থা রাখেনি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে এদেশীয় সহযোগী বাছাইয়ে হিন্দুসম্প্রদায়ের অভ্যন্তর থেকে

আনকোরা নতুন একটি অভিজাতগোষ্ঠী গড়ে তোলা ছিল তাদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ ও অবিকল্প পছন্দ। এ সুযোগটিকে কাজে লাগিয়েছে হিন্দুসমাজের একটি সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠী। নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশশাসনে ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় তারা রাতারাতি অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি ও সামাজিক কর্তৃত্ব লাভ করে। দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার পর এদেশে ইংরেজদের বাণিজ্য যেমন অবারিত হয়, তেমনি বাণিজ্যের মুনাফার সঙ্গে যুক্ত হয় ভূমিরাজস্বের বিপুল পরিমাণ অর্থ। রাতারাতি ফুলেফেঁপে উঠতে থাকে বণিকের ঝোলা। ক্ষমতা দখলের পর ইংরেজরা বাংলার সামন্তব্যবস্থাটিকেই অব্যাহত রাখে, কারণ এই ব্যবস্থাটিই তখন তাদের জন্য অধিক লাভজনক ছিল। বলাবাহুল্য, এসময়ে তারা বাণিজ্যের পরিবর্তে ভূমিরাজস্ব আয়ের দিকেই বেশি মনোযোগী হয়। এজন্য তারা রাজস্ব-আদায়কারীর পরিবর্তন ঘটায়; আর এর সঙ্গে পরিবর্তন হয় রাজস্বের পরিমাণের– বণিকের মুনাফার লোভের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে রাজস্ব। কিছুদিনের মধ্যেই ব্যবস্থাটিকে পাকাপোক্ত করতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জারি হয়। বাণিজ্যসহযোগীর ভূমিকায় অর্জিত উদ্বৃত্ত টাকার জোরে এবং ইংরেজদের প্রতি আনুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ নবগঠিত ক্ষুদ্র অভিজাতশ্রেণিটিই জমিদারির দায়িত্ব পায়। ইংরেজদের উপনিবেশ বিস্তার ও দখল স্থায়ীকরণে এ জমিদারশ্রেণি ছিল স্তম্ভস্বরূপ। জমিদারি পরিচালনা ও জমিদারিকে নির্বিঘ্ন করতে তারা গড়ে তোলে লাঠিয়াল বাহিনী। এই লাঠিয়াল বাহিনী অবাধ্য ও বিদ্রোহী প্রজাকে শায়েস্তা করে এদেশে ইংরেজ শাসনকে অপ্রতিহত করে তুলেছিল। *জননী*-তে রোহিণী চৌধুরীর লাঠিয়াল হিসেবে সাকেরের ভূমিকা ব্রিটিশ উপনিবেশি শাসনের এই দিকটিকে উন্মোচন করে। জমিদারদের স্বেচ্ছাচারী শোষণ-নির্যাতনে বাংলার সমাজ জীবনের জীবনীশক্তি একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়, সাধারণ প্রজাদের ত্রাহি অবস্থা হয়, তারা নিপতিত হয় চরম দারিদ্র্যে।

বলপ্রয়োগের পাশাপশি বাংলায় উপনিবেশি শাসনকে দীর্ঘায়িত করার কৌশল হিসেবে ইংরেজরা এদেশে তাদের দখলদারিত্বের পক্ষে স্থানীয় জনগণের সম্মতি অর্জন করার দিকে মনোযোগী হয়। অর্থাৎ দখলকৃত দেশের জনগণকে রাজি করিয়ে তাদেরকে শাসন করা। এটি ছিল নিরুপদ্রবে, অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ে ও অল্প আয়াসে ঔপনিবেশিক শোষণশাসন চালিয়ে যাওয়ার ধূর্ত কৌশল। এর জন্য উপনিবেশিতের মনে শুধু উপনিবেশকের প্রতি সম্ভ্রম ও সম্মোহন ভাব জাগানো প্রয়োজন ছিল; প্রয়োজন ছিল উপনিবেশিতের জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রুচিবোধ ও জীবনবোধ ও জীবনযাপনের সকল পরিসরে উপনিবেশকের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা গেঁথে দেওয়া। ইংরেজরা ভারতীয়দের সামনে উপস্থাপন করল যা কিছু ইউরোপীয়, তাই শ্রেষ্ঠতর, উন্নততর, মহত্তর। এক্ষেত্রে ইউরোপীয়, বিশেষত ইংরেজি সাহিত্যের নন্দন হলো তাদের সেরা সম্মোহনী উপকরণ। ইংরেজি সাহিত্যের সুবচনের আশ্রয়ে যুক্তিশীলতা, মানবতাবাদ, গণতন্ত্র, উন্নয়ন– মহোত্তম জীবনের এসব ধারণাকে উপনিবেশিত মানুষের কাছে পৌঁছে দিল। সম্মোহিত হলো এদেশের নবগঠিত ক্ষুদ্র অভিজাতশ্রেণির দ্বিতীয় প্রজন্ম। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্যে অভিভূত এই প্রজন্ম নিঃশর্ত আনুগত্যে সম্মতি জানাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের

প্রতি, সেই সঙ্গে অবারিত শোষণের প্রতিও। কারণ ইংরেজদের শোষণশাসনের অংশীদার হিসেবে ইংরেজদের বর্বরতার দিকটি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। ইংরেজদের সদর্প বিচরণের বিপরীতে তারা নিজেকে আবিষ্কার করল অসভ্য, বর্বর, হীনতর হিসেবে; তাদের মধ্যে তৈরি হলো নিজের ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ধর্ম বিষয়ে হীনম্মন্যতার বোধ; মানুষ হিসেবে তাদের আত্মবিশ্বাসের পারদ তলানিতে গিয়ে ঠেকল। কলোনির প্রজারা নিজের হীনতা নিয়ে মুখ লুকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল; শাপমোচনের উপায় হিসেবে তারা ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি আত্মস্থকরণে তৎপর হয়ে উঠল; কেউ কেউ বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, সাহিত্যকে 'গেঁয়ো' বলে বর্জন করল, আবার কেউ কেউ এমন চরম পথে না-হেঁটে ইউরোপীয় মানদণ্ডে শোধন করে নিল। অর্থাৎ দেশজ খোলসটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রাণপণে তারা ইউরোপীয় আদলে নিজেকে সাজানোর সাধনায় বিভোর হল। ইউরোপের আদর্শে নিজের সমাজটিকে ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করে একটি নতুন রূপ দেওয়া হলো। এদের অক্লান্ত সাধনায় ইউরোপের জ্ঞানবিভা আমাদের কুসংস্কারদীর্ণ কূপমণ্ডূক সমাজের অচলায়তনটি ভেঙে গেল। এটি ছিল সাম্রাজ্যবাদের সর্বগ্রাসী অন্ধকারের বিপরীতে এক প্রবল আলোর ঝলকানি। তাদের কর্মতৎপরতা ইতিহাসে চিহ্নিত হলো 'বাংলার রেনেসাঁ' হিসেবে। তারা হয়ে উঠল ইউরোপীয় আলোকপর্বের গর্বিত অংশীদার। শ্রেণি হিসেবে এদের পরিচয় হলো কলকাতার 'মধ্যবিত্তশ্রেণি'। সময়ের সিঁড়ি বেয়ে উপনিবেশের এই মেধাবী মানুষেরা নিজের স্থান সন্ধান করে ভিক্টোরিয়ার শাসনে ইংরেজদের সমতলে। সরকারি, বিশেষত 'Covenanted' পদে তারা নিয়োগ পাওয়ার দাবি জানায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের মেধার স্বাক্ষর রেখে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের চাকরির সুযোগ পায়। কিন্তু এ সুযোগ ছিল খুবই সীমিত, পার্শ্বপ্রবেশের মতো, তাদের ভূমিকা ও সম্মান ছিল পার্শ্বচরিত্রের মতোই। ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য ও নিজেদের অর্থনৈতিক সামর্থ্যই তাদেরকে সমাজের এই সুবিধাজনক অবস্থায় উপনীত করে। উপনিবেশি রাজনীতির এই দিকটি স্বল্পবাক পরিচর্যায় *জননী* উপন্যাসে বিম্বিত হয়েছে: "এই দ্যাখো, আমার সঙ্গে পাঠশালে সেই যে হরি চকোত্তির ছেলেটা ছিল, একদম হাবা, কত কান মলে দিয়েছি, মানসাংক পারত না, সেটা হাকিম হয়েছে। গাঁয়ে ত আর আসে না। সেটা হলো হাকিম! আর আমি? পাঠশালার সেরা ছেলে মজাই তাড়ি আর নেশা, মাঠে মাথার ঘাম পায়ে–" (শওকত, ২০১০, পৃ. ১৪৫)।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক গর্বিত নাগরিক হিসেবে মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রতিনিধিরা অধিকারবোধচেতন প্রজা হিসেবে নিজের হিস্যা বুঝে নিতে চায়। সে ভুলে যায় তার প্রকৃত আত্মপরিচয়– উপনিবেশের পরাধীন প্রজা, উপনিবেশের ঘেরাটোপে বন্দি নাগরিক। ইতোমধ্যে আকারে-ইঙ্গিতে তারা স্বাধীনতার দাবি তুলতে শুরু করে। সহযোগী যখন প্রতিযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ, তখন বিষয়টি ইংরেজ শাসকের কাছে বাড়াবাড়ি মনে হয়; লাগাম টেনে ধরার প্রয়োজন মনে করে। এই বাস্তবতায় এদেশীয় সহযোগী বাছাইয়ে ইংরেজরা তাদের নীতির পরিবর্তন করে। শতাধিক বছরের কালিক ব্যবধানে ইংরেজদের প্রতি মুসলমানদের বৈরিতার মনোভাব হ্রাস

পেয়েছে। ইতোমধ্যে বৈরিতা ত্যাগ করে ইংরেজদের সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত হলো মুসলিমসম্প্রদায়ের একটি সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠী, যাদেরকে শত বছর ধরে পরিশোধ করতে হয়েছে ব্রিটিশবৈরিতার চরম মূল্য। ইংরেজরা এরই সুযোগ নিল, সময়ের প্রয়োজনে মুসলমানদের সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে এনে হিন্দু সহযোগীদের সঙ্গে তাদেরকেও পাশে জায়গা দিল। ইতোমধ্যেই উপনিবেশি প্রভুর আশীর্বাদে দিন ফিরতে শুরু করেছে এই মুসলিম শ্রেণিটির। ইংরেজদের দুপাশে তখন দুই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা ইংরেজদের উপনিবেশি শাসনে সহযোগীর ভূমিকায়। ভূমিকা অভিন্ন হলেও দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক মিত্রত্বের নয়, প্রবল প্রতিযোগীর; স্বার্থের দ্বন্দ্বে পরস্পর মুখোমুখি। ইংরেজদের প্রতি আনুকূল্যের প্রতিদানে মুসলমান গোষ্ঠীটি হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণির এক চেটিয়া আধিপত্যে ভাগ বসায়। *জননী* উপন্যাসে এই ঐতিহাসিক সত্যের প্রকাশ ঘটেছে এভাবে: “মহেশডাঙা বর্তমানে দুই জমিদারের অধীন। ছ'আনি আর দশ আনি জমিদার। ছয় আনার মালিক হাতেম বখ্শ খাঁ। দশ-আনির অধিকারী রোহিণী চৌধুরী” (শওকত, ২০১০, পৃ. ১৪৯)। মহেশডাঙার জমিদারি দশ আনা-ছয় আনায় বণ্টন আসলে ইংরেজ শাসনে হিন্দু-মুসলমানের অংশীদারিত্বের একটি প্রতীকী সমীকরণ। রহিম বখ্শের উত্থানের কাহিনিটিও ধরা পড়েছে কোটালের কথনে: “রহিম খাঁয়ের বাবাকে কে না জানত? সুদখোর। সুদের পয়সায় জমিদার–” (শওকত, ২০১০, পৃ. ১৪৯)। কোটালের এই মন্তব্যের মধ্যেই সংগুপ্ত হয়ে আছে ব্রিটিশ উপনিবেশি শাসনব্যবস্থার অর্থনৈতিক নৈরাজ্যের রূপটি। আমাদের কথা হলো, এদেশীয় মানুষদের ধর্মীয় পরিচয়টা ব্রিটিশদের কাছে মুখ্য ছিল না, যদিও তারা এদেশের মানুষের ধর্মীয় পরিচয়টাকে তাদের পুরো শাসনামলেই প্রচণ্ডভাবে ব্যবহার করেছে। এদেশীয় মিত্র খুঁজতে তাদের প্রধান বিবেচ্য ছিল তাদের শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার পক্ষে প্রশ্নহীন আনুগত্য। এজন্যই সময়ে সময়ে দেশীয়দের সঙ্গে মিত্রত্বের পালাবদল ঘটেছে, মিত্রত্বের তুলনামূলক ভারসাম্যে হেরফের ঘটেছে। বস্তুত এদেশে তারা চিরস্থায়ী মিত্র খোঁজেনি, এটি তাদের শাসনকৌশলে ছিল না। মিত্রভাবের সঙ্গে হার্দিক সম্পর্কের একটি যোগসূত্র থাকে। না এই দেশের সঙ্গে, না এই দেশের মানুষের সঙ্গে ইংরেজদের কোনোকালে কোনোভাবেই হার্দিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি; হার্দিক সম্পর্ক গড়ার দায় তারা অনুভব করেনি, এবং এটি তাদের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের সঙ্গে মানানসইও ছিল না। এই দেশটিকে যতভাবে সম্ভব, যতটুকু সম্ভব শোষণ করাই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ শোষণপ্রক্রিয়ায় যে যতটুকু সহযোগিতা করেছে, তার সঙ্গে তাদের ততটুকুই সম্পর্ক গড়ে উঠেছে– সম্প্রদায়ের পরিচয় এখানে অবান্তর। একথা আজ সর্বজনবিদিত, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যকে তারা তাদের সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি মনে করত; সাম্রাজ্যের সুরক্ষার প্রয়োজনেই তারা হিন্দু-মুসলমান বিভাজনের রাজনীতিকে নানা কৌশলে জিইয়ে রেখেছিল। আধিপত্য বিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জমিদাররাও ধর্মের ব্যবহার করেছে যত্রতত্র, এদেশের সাধারণ মানুষদের সহজাত ধর্মবোধে হিংস্রতার পারদ ঢেলে। *জননী* উপন্যাসে আছে এই সাম্প্রদায়িক অপরাজনীতির বিশ্বস্ত চিত্র। মহেশডাঙার প্রতিদ্বন্দ্বী দুই জমিদারেরই ধর্মবোধ গভীর নয়, স্বীয় স্বার্থ হাসিলে প্রত্যেককেই ধর্মের রক্ষকের

ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। দুজনেই পাকা খেলোয়াড়ের মতো ধর্মের ধোঁয়ায় হাওয়া দিয়েছে, গ্রামে সাম্প্রদায়িক শত্রুতা ছড়িয়ে দিয়েছে বিঘা-পঞ্চাশেক জলাশয়ের দখল নিতে। উপন্যাসের অবয়বে রয়েছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিস্তৃত বর্ণনা, তারই একটি ক্ষুদ্র অংশ উদ্ধৃত হলো:

> "এতদিন জলাশয় চৌধুরীদের দখলে ছিল। দলিলে হাতেম খাঁর প্রাপ্য হইলেও সে ইহার পাশে ঘেঁষিতে পারে নাই। জলাশয় জমা লইয়াছিল কয়েকজন মুসলমান জেলে। ইহাদের ভদ্রবংশীয় মুসলমানেরা আত্‌রাফ বলে। বিলের আয় মন্দ নয়। হাতেম খাঁ কয়েকজন আত্‌রাফকে হাত করিয়া খাজনা বন্ধ করিয়া দেওয়ার প্ররোচনা দিল। তাহারা সেইমত খাজনা বন্ধ করিয়াছে। রোহিণী চৌধুরী এই শলাপরামর্শ ভালরূপে আঁচ করিয়াছিল। তিলি-বাগ্দী-ডোম শ্রেণীর কৃষক হিন্দু হাত করিয়া গ্রামে তিনি দাঙ্গার প্ররোচনা দিতে লাগিলেন।
>
> হাতেম বখ্‌শ ইদানিং ঘোরতর মুসলমান সাজিয়াছেন। তাঁর পুত্রেরা অন্দরমহলেই শরাব পান করেন। তিনি কোন কথা বলেন না। নিজেও নামাজ-রোজার ধার ধারেন না। বর্তমানে জুম্মার নামাজের সময় হাতেম বখ্‌শকে মস্‌জিদে দেখা যায়। তাঁর কালোশাদা দাড়ি শ্বেত-খোজাফে আরো শুভ্র রং ধারণ করিয়াছে। শাদা পিরহান হাঁটু পর্যন্ত ঝুলাইয়া একটি 'আসা' (ছড়ি) হাতে গ্রামের অন্ধকারে দারোয়ান সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ান। বৈঠক, শলা-পরামর্শ আর যুক্তির বহর। নামাজের সময় না হইলেও তিনি এত্তেলা দেন। নামাজ 'কাজা' করা শক্ত গোনাহ। হাদিস-কোরানের সম্প্রতি এজেন্সী লইয়াছেন তিনি। গ্রামের মখ্‌তবগুলির জীর্ণ-দশা। এক পয়সা তিনি খরচ করেন নাই। বর্তমানে তিনি 'তা'মদারী' করিয়া গ্রামের মুসলমানদের পোলাও-কোর্মা খাওয়াইলেন। কাফের হিন্দু জমিদারদের সর্বস্বান্ত করিয়া ছাড়িবে, এই কথা পাকে প্রকারে প্রচারণার খোলসে বিতরণ করিতে লাগিলেন।
>
> নিস্তেজ মহেশডাঙার জীবনে চাঞ্চল্য ফিরিয়া আসিয়াছে। হিন্দুপাড়ার রোহিণী চৌধুরীর কার্পণ্য নাই। প্রচারণা শক্তি তারও কম নয়" (শওকত, ২০১০, পৃপৃ. ২৫১–২৫২)।

দুই জমিদারের প্রযোজনায় নিস্তরঙ্গ গ্রামে সাম্প্রদায়িক হিংসার তরঙ্গ নেমে এলো, সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের চিরদিনের সম্প্রীতির সম্পর্কে ফাটল ধরল, জমিনের সমতলে যারা একই সঙ্গে যুগপরম্পরায় চাষবাস করে আসছিল তাদের হার্দিক বন্ধন ছিন্ন হলো, পরস্পরে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো, পরিণামে দুই সম্প্রদায়ের দুইজন শিবু ও ইসমাইল– 'দুইজনে খুব পরিচিত বন্ধু'– অসহায়, দরিদ্র মানুষ দুটি নিজেদের পরিবারকে চরম অসহায়ত্বে ফেলে রেখে নিহত হলো,

আরও অনেকে জখম হলো। দুই জমিদারের দ্বন্দ্ব একসময় স্তিমিত হয়ে এলো, এর দগদগে দাগের চিহ্ন কিছু মুছল, কিছু রয়ে গেল; কেউ কেউ এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ফাঁকি বুঝল, আবার কেউ কেউ বুঝলও না; কিন্তু আপাতত তার উত্তেজনা চাপা পড়ল আবার সময়-সুযোগে আত্মপ্রকাশ করবে বলে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, উপন্যাসে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার চাপটা পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, নারীরা এতে অংশগ্রহণ করেনি, বরং প্রত্যাখ্যান করেছে। এলোকেশীর মন্তব্যে তার একটি প্রতিফলন: "গাঁয়ে হিন্দু-মুসলমান ঝগড়া ত ভাইয়ের সঙ্গে কী। যতসব অপসিষ্টি, হতচ্ছাড়া লোক" (শওকত, ২০১০, পৃ. ২৫৩)।

দরিয়াবিবির সন্তানের নামকরণে হিন্দু নারী শৈরিমির স্মৃতির যে প্রেক্ষাপট উন্মোচিত হয়েছে তা সর্বকালের মানবিকবোধের এক অসামান্য উদাহরণ: "দরিয়াবিবি ছোট মেয়েটির নাম রাখিয়াছিল শরীফন। ডাকনাম শরী। শৈরিমীর স্মৃতি একবার তার মনে জাগিয়াছিল বৈকি। সেই দীন-জীবনের করুণ অবসান-মুহূর্ত! ডাকনামে শৈরিমীর স্মৃতি বাঁচিয়া থাক। দেশের বিশাল মানচিত্রের এক কোণে নামহীন গ্রাম্য জননীর দীন প্রচেষ্টা– জাতি-ধর্ম যেখানে নৈরাজ্যের কোন ফণা মেলিতে পারে না" (শওকত, ২০১০, পৃ. ২৫১)।

৬.

"দুঃখ কি সহজে যায়? ব্রিটিশ রাজত্ব। আগে ব্রিটিশ যাক, রোহিণী-হাতেম বখ্শ ঐ শালারা যাক, তবে না দুঃখ যাবে" (শওকত, ২০১০, পৃ. ২৭৯)। সংলাপটি চন্দ্র কোটালের, যে একজন হিন্দু চাষি, দারিদ্র্যের কষাঘাতে ন্যুব্জ; ক্রমাগত পেশাবদলেও যার দারিদ্র্য থেকে মুক্তি ঘটে না, 'নামাজী-মুসল্লী' (শওকত, ২০১০, পৃ. ১৮৪) আজহারের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। তাদের আন্তরিক সম্পর্কের ভিত হলো উভয়েই দরিদ্র এবং একই ময়দানে তাদের পেশাগত জীবন। সাম্প্রদায়িক উস্কানির সাময়িক বিচ্ছেদ শেষে চন্দ্র কোটালের পুনর্মিলনের সংলাপটি তাৎপর্যপূর্ণ: "আজহার ভাই। গরীবে গরীবে যদ্দিন বেঁচে আছি, আর ধর্মের কথা কানে আনছি না" (শওকত, ২০১০, পৃ. ২৭৫)। আজহার-কোটাল দুজনের জীবনে কেবল ধর্মটুকুই আলাদা, আর সবই ত এক– এক মাঠ, এক জল, ভাষা এক, দারিদ্র্য একই রকম, জীবন-সংগ্রাম আর জীবন-যাপনের ধরনও অভিন্ন। ঔপনিবেশিক শাসনে কেউই ধর্মের পরিচয়ে বিশেষ সুবিধা পায়নি। দরিয়াবিবির মন্তব্যে ফুটে ওঠে এ সত্য: "গরীব হিঁদু আর মুসলমান নিজের জেতের কাছেই হোক আর অপরের জেতের কাছেই হোক, একই রকম মান-মজ্জিদে পায়" (শওকত, ২০১০, পৃ. ১৯৯)। একই ধর্মের এবং একই শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থী হয়েও হরি চকোত্তির ছেলের সঙ্গে কোটালের সামাজিক অবস্থান ভিন্ন হয়ে গেল, আবার আপন ফুপাতো ভাই ইয়াকুবের সঙ্গে আজহারের বিস্তর পার্থক্য; আর আজহার-কোটাল দুইজন দুই ধর্মের হলেও তাদের মধ্যে নিবিড় নৈকট্য। এই পার্থক্য-নৈকট্যের সমীকরণটি গড়ে উঠেছে ঔপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ায় কে কীভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে। যারা ঔপনিবেশিক শোষণপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পেরেছে তারা

অর্থনৈতিক সম্পন্নতা অর্জন করেছে, আর ঔপনিবেশিক ধূর্ততার সঙ্গে যারা শামিল হতে পারেনি, তারা শোষণের শিকার হয়ে নিঃস্ব হয়েছে– ধর্মীয় পরিচয়ের বিষয়টি এখানে একান্তই মূল্যহীন। উপনিবেশবাদী ব্যবস্থার গোড়ার কথাই হলো মুনাফা, সীমাহীন মুনাফার লোভ। সীমাহীন লোভের বশবর্তী হয়েই ইউরোপীয়রা পৃথিবীময় উপনিবেশ বিস্তার করেছে; মুনাফার হিসাব মেলাতে গিয়ে হেন কোনো অপকর্ম নেই যা তারা করেনি; আবার উপনিবেশিত জনগণের সামনে নিজেদের মহত্তম ভাবটি তুলে ধরতে কিছু উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডও পরিচালনা করেছে, যা আবার তাদের উপনিবেশ রক্ষা ও মুনাফার হিসাবের সঙ্গে জোড়বাঁধা। মুনাফার ভাগ সবাইকে দেওয়া সম্ভব ছিল না; তাই উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর ভেতর থেকে একটি ক্ষুদ্র অভিজাতশ্রেণি তৈরি করেছে। এই অভিজাতরা ইউরোপীয় ভাষা শিখেছে, সামাজিকতা আয়ত্ত করেছে, ইউরোপীয় ধাঁচের শিক্ষা পেয়েছে। ইউরোপীয়রা অভিজাত উপনিবেশিতকে সাম্রাজ্যবাদী গণিত শিখিয়েছে। এই গণিত চক্রবৃদ্ধি মুনাফার হিসাব আর সেই মুনাফা অর্জনের কৌশল শিখিয়েছে; আর এর সঙ্গে শিখিয়েছে ধূর্ততা ও প্রতারণার মন্ত্র। এরা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে উপনিবেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ওপর অর্থনৈতিক শোষণ চালিয়েছে। উপনিবেশি অর্থনীতির ব্যাকরণটাই এমন– উপনিবেশক থাকবে এবং আর থাকবে তাদের সহায়ক দেশীয় গোষ্ঠী, যারা সংখ্যায় হবে অল্প, কিন্তু ধূর্ত ও কর্মপটু; এরা সম্মিলিতভাবে সর্বাত্মক শোষণ চালাবে, আর বিপরীতদিকে থাকবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, যারা উৎপাদনযন্ত্র হিসেবে কাজ করবে এবং বিনা বাক্যব্যয়ে উৎপাদিত পণ্যের বেশিরভাগ তুলে দেবে তাদের প্রভুদের হাতে। এই শোষণপ্রক্রিয়ায় সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠবে, উপনিবেশকরা শোষণলব্ধ সম্পদের সিংহভাগ নিজের দখলে নিয়ে নিজ দেশে পাচার করবে, আর তাদের দেশীয় সহযোগীরা শোষণলব্ধ সম্পদের অংশবিশেষ নিয়ে অভিজাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে, ভোগবিলাসময় জীবনযাপন করবে। আর দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী শোষণে শোষণে ক্রমাগত নিঃস্ব, নীরক্ত হবে; অবশেষে তারা সর্বরিক্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হবে। তাই যতদিন না উপনিবেশি শাসনের অবসান হবে, ততদিন এই প্রান্তিক মানুষদের দুর্দশার অবসান হবে না, এই সত্যটিই এই পরিচ্ছেদের গোড়ায় উল্লেখিত কোটালের ভাষ্যে ধরা পড়েছে।

৭.

ভারতে প্রায় দুশো বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে অর্থনৈতিক শোষণ প্রক্রিয়ার ধারাটি একই রকম ছিল না, রূপান্তরের নিয়ম মেনে এগিয়েছে। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলায় উপনিবেশি অর্থনীতি তিনটি ধাপে বিভক্ত। এর প্রথম ধাপ ভূমিরাজস্ব নির্ভর; দ্বিতীয় ধাপে ভূমিকরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাণিজ্যের প্রসার, তৃতীয় ধাপে পূর্বোক্ত দুই ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিল্প-অর্থনীতি। *জননী* উপন্যাসে উপনিবেশি অর্থনীতির ক্রমধারাটি নিপুণ দক্ষতায় চিত্রিত হয়েছে। উল্লেখের দাবি রাখে, সপ্তদশ শতকেই বাংলার সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। ইউরোপীয় বণিকদের প্রভাবেই বাংলার অর্থনৈতিক

ব্যবস্থার এই রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল। কুটিরশিল্প, বিশেষ করে বাংলার বস্ত্রপণ্যের প্রচুর চাহিদা ছিল এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন বাজারে। আর এই বস্ত্রব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল ইউরোপ, বিশেষ করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকেরা। এই সময়ে তারা বাংলার বস্ত্রশিল্প খাতের উন্নয়নে প্রচুর বিনিয়োগও করেছিল। কিন্তু উপনিবেশ স্থাপনের শুরু থেকেই ইংরেজ বণিকরা বাণিজ্যের পরিবর্তে ভূমিরাজস্ব আদায়ের প্রতি অধিক মনোযোগী হয়। উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম পর্যায়ে পুঁজিবাদী উপনিবেশকরা মুসলিম শাসনামলের সামন্তব্যবস্থাটিকে অব্যাহত রাখে এবং এটিকে আরো বেশি লাভজনক করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করে চিরস্থায়ী রূপ দান করে। স্বেচ্ছাচারী ভূমিরাজস্ব আদায় ও বেপরোয়া বাণিজ্যের অর্থে ব্রিটিশ বণিকদের বাণিজ্যপুঁজি বিকশিত হয় এবং দ্রুত তা ফুলেফেঁপে ওঠে। একপর্যায়ে তারা এই উদ্বৃত্ত বাণিজ্যপুঁজি দিয়ে মনোযোগী হয় শিল্পস্থাপনে। ভারতশোষণের অর্থ দিয়ে নিজদেশ ইংল্যান্ডে ভারি শিল্পকারখানা গড়ে তোলে। এই কারখানার কাঁচামাল জোগায় ভারত; এবং এর ভোক্তাও ভারতের জনগণ। ভারতের কৃষকদের উৎপাদিত সস্তা কাঁচামাল জাহাজে করে ইংল্যান্ডে গিয়ে আবার জাহাজে করেই কৃষকদের কাছে ফিরে আসে অধিক মূল্যের শিল্পপণ্য হয়ে। এতে করে বণিকদের মুনাফা বেড়ে যায় বহুগুণে। এই প্রক্রিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশে শোষণের মাত্রা আরও বাড়ে। এদেশে উপনিবেশকরা শিল্পস্থাপনের কোনো ঝুঁকি নেয়নি, কারণ তাদের মন ছিল উপনিবেশের দখল হারানোর দুশ্চিন্তায় সবসময় তটস্থ। তাদের বিনিয়োগকে ঝুঁকিমুক্ত করতে এবং নিজ দেশের মানুষদের কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে তারা ইংল্যান্ডেই শিল্পকারখানাগুলো গড়ে তোলে। উপরন্তু তাদের পণ্যের বাজারকে অবারিত করতে ভারতের ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলো ধ্বংস করে দেয়। এরমধ্যে বাংলার বিশ্ববিখ্যাত তাঁতশিল্প ধ্বংস করতে নির্মম নৃশংসতার আশ্রয়ও নেয় তারা। এত বৈরিতার পরেও যে-সকল তন্তুবায় তাদের ঐতিহ্যগত পেশায় টিকেছিল, তারাও শেষপর্যন্ত কলে তৈরি মিহি কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি; অবশেষে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে দারিদ্র্যের কঠিন নিগড়ে বন্দি হয়। *জননী* উপন্যাসে শিল্পধ্বংসের চিত্রটি পাওয়া যায় কোটালের উক্তিতে: "সে দিন আর নেই ভায়া। ঐ ত ক'ঘর তাতী আছে, তাদের কাপড় কেউ ছোঁয়? অবস্থা দেখছ না তাদের? সব কপালের ফের।" (শওকত, ২০১০, পৃ. ১৭২)। দেশীয় অভিজাতরাও শিল্পস্থাপনের পরিবর্তে তাদের অর্জিত অর্থ ভোগবিলাসে ব্যয় করে। নিজেদের বাণিজ্যকে অপ্রতিহত করতে ইংরেজরা দেশীয় বণিকদের ব্যবসাকে বাঁধাগ্রস্ত করার নানা জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বাংলার অর্থনৈতিক রূপান্তরের দ্বিতীয় ধাপে দেশীয় অভিজাতশ্রেণি তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ বাণিজ্যে নিয়োজিত করার সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা মধ্যস্বত্বভোগীর– কৃষকদের কাছ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে ইংল্যান্ডের শিল্পের জন্য জোগান দেওয়া এবং ইংল্যান্ডের শিল্পপণ্য এদেশের বাজারে বিপণন করা। তাদের বাণিজ্যপুঁজি বড় জোর ব্যাংকিং খাত ও শেয়ারবাজার পর্যন্ত পৌঁছেছিল। বাণিজ্য অর্থনীতির এই পর্যায়ে পুরোনো হিন্দু-বণিকদের সঙ্গে শামিল হয় মুসলমান বণিকশ্রেণি। *জননী*-তে এর প্রতিফলন ঘটে ইয়াকুব চরিত্রের মাধ্যমে। এই বণিকশ্রেণি ধীরে ধীরে জমিদারদের প্রভাব-প্রতিপত্তিতে

জমিদারদের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে। উপনিবেশি শাসনামলের শেষপর্যায়ে এসে ইংরেজরা খুবই সীমিত পরিসরে প্রচণ্ড শ্রমঘন কিছু কলকারখানা, বিশেষ করে কিছু চটকল প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে এদেশের বিপন্ন মানুষেদের শ্রম বিক্রি হয় স্বল্পমূল্যে। অর্থাৎ ভারতে চটকল স্থাপন ছিল ইংরেজদের মুনাফানীতিরই একটি অংশ। বেকারত্বের চাপ আর ভারতের অর্থনৈতিক সংকট এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, চটকলের সস্তাশ্রমিক হওয়াও ছিল এক অসাধ্য সাধনা। বাংলায় উপনিবেশি অর্থনীতির তৃতীয় ধাপে দেশীয় বণিকদের মধ্যেও কেউ কেউ শিল্প স্থাপনে মনোযোগী হয়, যারা অর্থনৈতিক সক্ষমতায় সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। *জননী*-তে এর উল্লেখ আছে এভাবে: "শহরেই ত সব। গাঁয়ের জমিদারদের চেয়ে ঐ ব্যবসাদারদেরই টাকা বেশি। তালেব চৌধুরী লোহার কারখানা করে দেখছ ফেঁপে যাচ্ছে। হাতেম খাঁকে দশবার কিনতে পারে" (শওকত, ২০১০, পৃ. ১৭২)।

৮.

উপনিবেশ-পূর্ব সামন্তবাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যস্থতায় চোরাস্রোতের মতো পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটি বিকশিত হচ্ছিল। এসময় কুটিরশিল্পের বিকাশ বাংলার অর্থনীতিকে যথেষ্ট চাঙা করে তুলেছিল। সামন্ত-অভিজাতদের পাশাপাশি পুঁজিপতিগোষ্ঠীও অনেক প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে। ইউরোপীয় বণিকদের, বিশেষত ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে দেশীয় পুঁজিপতিদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। সামন্তশাসক নবাবের প্রভাবশালী অমাত্যরাও– জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ প্রমুখ– পুঁজিবাদের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিল এবং তাদের পুঁজির ওপর নবাবের প্রভূত নির্ভরশীলতাও ছিল। বাণিজ্যের কারণেই জগৎশেঠদের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক নিবিড় হয় এবং পরবর্তীকালে তা নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে। দেশীয় পুঁজিপতিদের সহযোগিতায় উপনিবেশস্থাপনের পর ইংরেজরা বাংলার স্বাভাবিক অগ্রযাত্রার বিকাশকে রোধ করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বদলে শোষণব্যবস্থাকে কায়েম করার উদ্দেশে প্রতিষ্ঠা করে সামন্ততান্ত্রিকব্যবস্থা। দেশীয় পুঁজিপতিদের নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত করার সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তাদের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থায় মোগল আমলের সামন্তকাঠামোটি পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। এব্যবস্থায় কৃষকরা জমির দখলিস্বত্ব হারায়, জমির একচ্ছত্র মালিক হয় জমিদাররা। মোগল আমলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা খাজনায় রেয়াত পেত, কখনো কখনো কৃষকদের ক্ষতিপূরণও দেয়া হতো। কিন্তু ইংরেজদের প্রবর্তিত রাজস্ব ছিল নির্ধারিত ও উচ্চহারের; এবং রাজস্ব আদায়ে তারা ছিল অনড় ও নির্মম। একারণেই ১৭৭০ সালের মহাদুর্ভিক্ষের বছরেও তাদের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বেশি। কোনোক্রমে দিনযাপন করা ছাড়া কৃষকদের গত্যন্তর ছিল না। কুটিরশিল্পগুলোও শোষণে-দমনে ধ্বংস হয়ে যায়। বেকার হয়ে পড়ে বিভিন্ন কুটিরশিল্পের সঙ্গে জড়িত কারিগরেরা। ইংল্যান্ডের সাম্রাজ্যবাদ তাদের উপনিবেশি মুনাফার হিসাবে জেরবার করে দিয়েছে হার্দিক সম্পর্কের ভিতে গড়ে ওঠা বাংলার যৌথজীবনচেতনার সমাজকাঠামোটি। মুনাফালোভী শোষণপেষণে মানুষের পারস্পরিক

সম্পর্কের সুতোগুলো ছিন্ন হয়ে যায়, মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বাড়ে, অভাবের ঘায়ে দিশেহারা প্রান্তিক মানুষেরা ছিন্নমূল সত্তায় পরিণত হয়। *জননী* উপন্যাসের সমস্ত আখ্যান জুড়ে চিত্রিত হয়েছে চিরায়ত বাংলার এই ভেঙে পড়ার দৃশ্য। উপনিবেশ-উদ্ভূত দারিদ্র্যের করুণ চেহারাটি এ উপন্যাসে ধরা পড়েছে এভাবে: "চারিদিকে বিপদের বেড়াজাল। প্রত্যেকে আত্ম-বিব্রত। গরীব কৃষক-পল্লীর ভেতর সহানুভূতি বুক-ফাটা নিঃশ্বাসের রূপ ধরিয়া বাতাসে ধ্বনিত হয়" (শওকত, ২০১০, পৃ. ১৮২)। এ উপন্যাসের আজহার, কোটাল, দরিয়া, শৈরিমি– প্রত্যেকেই ঔপনিবেশিক আগ্রাসনে বিপন্ন বাংলার হতভাগ্য প্রতিনিধি।

আজহার খাঁর রয়েছে সম্ভ্রম জাগানিয়া মোগল আভিজাত্যের ইতিহাস, যেখানে ছিল অর্থনৈতিক সম্পন্নতা, পারিবারিক পরিবেশে ছিল উন্নত শিক্ষা-সংস্কৃতির চর্চা। পূর্বপুরুষেরা ছিল প্রত্যেকে ফারসি-জানা পণ্ডিত। সবকিছু মিলিয়ে পরিবারটির পরিচয় দাঁড়ায়– ভারত উপমহাদেশে মুসলমান শাসনামলের অভিজাত মুসলিম পাঠান পরিবার। ইংরেজদের কাছে রাজ্য হারিয়ে রাজ্য-পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম করতে করতে এই অভিজাত পাঠান পরিবারের আদিপিতা মজহার খাঁর বাংলায় আগমন। ঔপন্যাসিকের বর্ণনানুসারে: "শান্-শওকত দব্দবা তাঁর আমলেই ছিল। তারপর খাঁ পরিবারের অধঃপতনের যুগ। ইমারতের আকাশ হইতে আলী মজহার খাঁর বংশধরেরা আজ খড়োঘরের মাটিতে নামিয়াছে। শিক্ষা-সংস্কৃতি সব নিরুদ্দিষ্ট। বিগত ইতিহাসের স্বপ্ন তার কাছে ধূসর মরীচিকার মতো মাঝে মাঝে জীবন-সংগ্রামের নিরাশা-ক্লিষ্ট ক্ষুব্ধ মুহূর্তে ভাসিয়া আসে বৈকি। ... আলী মজহার খাঁর পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষের একটি যুবক নির্জীবতার জন্য নিরীহ এমন অপবাদ দেড়শ' বছর আগে কেহ মুখে উচ্চারণেও সাহস করিত না। কর্মময় জীবনের ক্ষেত্রে, সাংসারিকতার নাগপাশ, দাসত্বের বেড়ি, পলিমাটির অদৃশ্য যোজনা শক্তি, কোথায় কিরূপ এখানে কাজ করিয়াছে, কেহ তাহার ইতিহাস জানে না" (শওকত, ২০১০, পৃ. ১২২)। ঔপনিবেশিক আমলের এই উপনিবেশি ইতিহাস উপনিবেশের নিয়মেই হারিয়ে গেছে। ঔপনিবেশিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক যুগে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক নিয়মেই বিরোধিপক্ষের প্রতি ইংরেজরা নির্দয় আচরণ করেছে, বিশেষত সদ্য রাজ্য হারানো মুসলমান অভিজাতদের প্রতি তাদের নির্দয়তা ছিল চরম পর্যায়ের। আর মুসলমান অভিজাতরাও তাদের পুরোনো শানশওকতের কথা স্মরণ করে কোনোভাবেই ইংরেজদের সহ্য করতে পারছিল না। তাই তারা সুযোগ পেলেই প্রতিনিয়ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে, কখনো কখনো এধরনের প্রতিরোধ ইংরেজদেরকে খুব বিব্রতকর অবস্থায়ও ফেলে দিয়েছে। তাই ইংরেজরা এই ধরনের অভিজাত মুসলমানদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা ভেঙে দেওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। আলী আজহার খাঁর পরিবারের বর্তমান দুরবস্থার ইতিবৃত্ত এই উপনিবেশি ইতিহাসের সঙ্গে বাঁধা। উপনিবেশি শাসনের অভিঘাতে বাংলার মুসলমানসমাজের, এতদ্সঙ্গে সকল ভারতীয়ের জীবনে নেমে আসা ভাগ্যবিড়ম্বনার ইতিহাস উন্মোচনই এ উপন্যাসের উপজীব্য হয়েছে। আলী আজহার খাঁর বর্তমান পরিচয় হলো উপনিবেশের পরাধীন

নাগরিক। কৃষিকাজ করে, রাজমিস্ত্রীর কাজও জানে। পরিশ্রমের অন্ত নেই, কিন্তু পরিবারের অভাব ঘোচে না। পরিবারে দারিদ্র্যের হানা সামলাতে না পেরে মাঝে মাঝেই সে কাউকে কিছু না-জানিয়েই নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যায়। পরিবারের খোঁজ নেয় না বললেই চলে। তবে যেখানেই যাক, জীবিকার সন্ধানেই থাকে। ব্যবসা করার নেশা আছে, কিন্তু পুঁজির অভাব প্রকট, তারপরেও হার মানতে চায় না, অনেক কষ্টে জমানো টাকায় মনোহারী দোকান খোলে, তার এ চেষ্টা চলে বারংবার, কিন্তু ব্যর্থতা আসে অনিবার্যভাবে, নিয়তির মতো। কারণ ঔপনিবেশিক বাস্তবে ব্যবসায় সফল হওয়ার কৌশল তার অজানা। অভাবের কারণে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কটাও আলগা। কোথাও সে থৈ পায় না। সে স্বপ্নও দেখে না। সে প্রকৃতপক্ষে কোথাও নেই– না বাস্তবে, না কল্পনায়; এক সর্বগ্রাসী অভাব তার বাস্তবকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়েছে, ছিনিয়ে নিয়েছে স্বপ্নকে। এমনি সর্বস্বান্ত সে। এক চরম বিচ্ছিন্নতা তাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ, আল্লাহর প্রতি তার অবিচল বিশ্বাস এক সময় টাল খায় অভাবের প্রচণ্ড তাণ্ডবে। আজহার খাঁর কোনো চেষ্টাই সফল হওয়ার নয়; কারণ সে উপনিবেশের শৃঙ্খলিত মানুষ, শোষিত হওয়াই তার নিয়তি, জীবনে পরাভবই তার অবধারিত গন্তব্য।

আজহার খাঁর ইতিবৃত্ত আমাদের সামনে ইতিহাসের আরেকটি সত্যের উন্মোচন করে, সেটি হলো– আজহার খাঁয়েরা পৃথিবীর যে ভূখণ্ড থেকেই বাংলার ভূখণ্ডে আসুক না কেন, কালক্রমে তারা এদেশের পলিমাটির মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, এদেশের মৃত্তিকায় তাদের শেকড় গেঁথে দিয়েছে, সম্পন্নতায়-বিপন্নতায় এদেশের জলহাওয়ায় তারা মিশে গিয়েছে। সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলায় বহু বহিরাগত শাসকগোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে, এদেশ শাসন করতে গিয়ে এদেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গেই তারা মিশে গিয়েছে। বাংলার ভালো-মন্দের সঙ্গে তাদের নিজের ভাগ্যকে চিরদিনের জন্য বেঁধে নিয়েছে। সে-সকল বহিরাগত শাসকরা বাংলার চিরায়ত সমাজব্যবস্থাটিকে অক্ষুণ্ন রেখে সে-ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেরাই মিশে গেছে। কিন্তু অন্য বহিরাগত শাসকদের সঙ্গে ইংরেজদের পার্থক্য হলো তারা কোনোদিনই এদেশটিকে তাদের নিজের দেশ ভাবেনি, এদেশের ভালো-মন্দের সঙ্গে নিজের কোনো বন্ধন গড়ে তোলেনি। তারা এদেশে এসেছে মুনাফা করতে এবং মুনাফার অর্থ নিজদেশ ইংল্যান্ডে পাঠাতে; একদিনের জন্যও তারা তাদের সে ব্রতের কথা ভোলেনি। তাই এদেশে নির্মম স্বেচ্ছাচারিতায় শোষণশাসন চালাতে ইংরেজরা কোনোকালেই বিন্দুমাত্র বিব্রত হয়নি। তাই অন্য বহিরাগত শাসনে বাংলার সমাজকাঠামোটি বরাবর অক্ষুণ্ন ছিল, ইংরেজদের বেপরোয়া শাসনে সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজকাঠামোটি ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যায়। নতুন সমাজব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে, বাংলার মানুষেরা এক চরম অস্তিত্বসংকটে নিপতিত হয়; ক্ষুধায়-মঙ্গায়-দুর্ভিক্ষে বারবার অসংখ্য মানুষ মৃত্যুবরণ করে, যা বাংলার ইতিহাসে এর আগে কখনোই ঘটেনি। উপনিবেশি শাসনের অভিঘাতে ভেঙে যাওয়া গ্রামবাংলার এই বিপন্ন মানুষদের জীবনচিত্রই *জননী* উপন্যাসে রূপ লাভ করেছে।

চন্দ্র কোটাল আজহার খাঁর ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু; একই নিয়তির বন্ধনে বাঁধা। বিচিত্র তার পেশা, কিন্তু নিয়তি দারিদ্র্যের কাছে ধরাশায়ী। সে ভাঁড় সাজে, মাছ ধরে, কৃষিকাজ করে, কিন্তু অভাব তার নিত্যসঙ্গী। ভাগ্য ফেরানোর স্বপ্নে ব্যবসায়ের প্রতি আজহারের মতো সেও আগ্রহী, কিন্তু পুঁজির অভাবে সে অসহায়। সে মানবিক বোধসম্পন্ন, পরোপকারী, মনেপ্রাণে অসাম্প্রদায়িক; সাময়িক সাম্প্রদায়িক আচরণ তার চরিত্রের একটি বিভ্রমমাত্র। সে বিপন্ন, ভাগ্যবিড়ম্বিত, তবে সে সৃষ্টিশীল; সে কবি, প্রতিভাধর কবিয়াল। সে উপনিবেশি ভাবধারার কবি নয়, আবহমান বাংলার চিরায়ত ভাবধারার কবি। সে দরিদ্র, কিন্তু উপনিবেশি প্রতারক সংস্কৃতির সঙ্গে হাত মেলায়নি, বরং সে উপনিবেশবাদকে ঘৃণা করেছে। সে তার দারিদ্র্যের কারণ সম্পর্কে জ্ঞাত। দারিদ্র্যমুক্তির উপায় তার জানা– উপায়টি উপনিবেশি শাসনের অবসান: "দুঃখ কি সহজে যায়? ব্রিটিশ রাজত্ব। আগে ব্রিটিশ যাক, রোহিণী-হাতেম বখ্শ ঐ শালারা যাক, তবে না দুঃখ যাবে" (শওকত, ২০১০, পৃ. ২৭৯)। সে মনেপ্রাণে উপনিবেশক ইংরেজ ও তার এদেশীয় সহচরদের ঘৃণা করেছে, তাদের পরাভব কামনা করেছে। বাঙালির ইতিহাসের এক অমোঘ সত্য এই যে, ইউরোপীয় সংস্কৃতির অন্ধ-অনুকারীরা এদেশের লোকজ ধারার সাহিত্যকে ঘৃণা সহকারে বর্জন করেছিল, এমনকি সাহিত্যের ইতিহাস থেকে কবিয়ালদের সাহিত্য কর্মগুলোকে মুছে ফেলেছিল। এটি ছিল ইংরেজদের প্রতি তাদের দাস্যমনোবৃত্তির একটি বহিঃপ্রকাশ। এ বর্জনে হয়ত হিন্দু মধ্যবিত্তের জাত ক্রোধ নিহিত রয়েছে; দেশজবোধে উদ্বুদ্ধ কবিয়ালদের রচনায় হয়ত শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি ইংরেজদের প্রতি তাদের গোলামির রূপাঙ্কণ দেখতে পেয়েছিল। আমরা অনুমান করি, আঠারো শতকে ইউরোপীয় ঘরানার সাহিত্যসাধনার সমান্তরালে আমাদের দেশজ ধারার যে স্বাধীন সাহিত্যের ধারাটি বাংলায় চলমান ছিল, কবিয়ালদের মধ্যে যে দেশপ্রেম ও স্বাধীনচেতা মনোভাব সক্রিয় ছিল, শওকত ওসমান আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের সেই অনালোকিত পর্বটিকে উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন কোটাল চরিত্রের মাধ্যমে।

৯.

মা/জননী কনসেপ্ট মানুষের চিরায়ত জীবনবোধের এক আবেগীয় এলাকা, জননীর দেহের আশ্রয়ে একটি অতি ক্ষীণ ভ্রূণ যেমন পায় প্রাণের দাঢ্য বিস্তার, তেমনি সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির অন্বয়ে গঠিত মানুষের বিচিত্র জীবনবোধ রূপায়ণের বহুদ্যুতিময় এক বীজতলা। মা বিশ্বসাহিত্যেরই এক জনপ্রিয় ও লক্ষ্যভেদী অনুষঙ্গ, যার আশ্রয়ে বহুস্তরীভূত জীবনসত্য ভাজে ভাজে উন্মোচিত হয়েছে। ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' উপন্যাসে মা হয়ে উঠেছে শোষণপীড়িত মানুষের মুক্তিসংগ্রামের এক চিরায়ত বাতিঘর। আবেগপ্রবণ বাঙালি সন্তানের জীবনবোধ ও জগৎভাবনা জননী নামের শেকড়ের আশ্রয়েই মঞ্জরিত হয়। বাংলা সাহিত্যের শক্তিমান দুই কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শওকত ওসমান যে বিশাল উপন্যাসভুবন সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের দুজনেরই প্রথম দিককার উপন্যাসের শিরোনাম *জননী*। দুই উপন্যাসেরই কেন্দ্রীয় উপজীব্য দুই জননীর জননিত্বের সাধনা– দুই জননীই দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামশীল,

জননীত্বের মহিমায় দুজনই বর্ণময়; কিন্তু দুই ঔপন্যাসিকের হাতে শেষপর্যন্ত এই জননীদ্বয় ভিন্ন জীবনবোধের প্রতিবিম্ব। মানিকের জননী শ্যামার সন্তানের প্রতি মমত্ববোধ অপরিসীম, কিন্তু কলুষমুক্ত নয়। নিজ সন্তানের প্রতি অন্ধ আবেগ পোষণ করলেও তার মাতৃত্ববোধ সর্বজনীন বিভায় উজ্জ্বল নয়। তার মাতৃত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অসূয়া এবং নীচতা; মাতৃত্বের কারণেই সে স্বামীর সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে, পুত্রবধূর প্রতি হয় নির্দয়; মাতৃত্বের কারণেই চৌর্যবৃত্তিতে তার দ্বিধা নেই, অন্যের অনুগ্রহ পাওয়ার ক্ষেত্রে নির্দ্বন্দ্ব, তার আত্মসম্মানবোধ শিথিল। অন্যদিকে শওকত ওসমানের জননী বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত– দরিয়াবিবি প্রখর আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন, অন্যের দান গ্রহণে তার চরম অনীহা, জাকাত গ্রহণকে মনে করে মনুষ্যত্বের অবমাননা হিসেবে, এমনকি প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর সেই সংসার ত্যাগ করেছে স্বামীর সম্পদে তার এবং তার সন্তান মোনাদিরের অধিকার নেই বলে, দাস্যবৃত্তিকে সে সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করে। প্রবল দায়িত্বশীলতায় সে অক্ষুণ্ন রেখেছে এক বিপন্ন সংসারকে। চরম অসহায়ত্বে নিপতিত এ জননী মাতৃদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়; কিন্তু এতে তার বিবেকী দংশন কম নয়। স্খলনের শিকার হয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মহননে বাধ্য হয়। শ্যামার করুণ অবস্থায় নিপতন সমাজের কঠিন সত্যের অমোঘ নিয়মে আসেনি; এসেছে প্রতারক, দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বামীর অবিমৃষ্যকারিতার কারণে। আর দরিয়ার বিপণ্নতা এসেছে এক কঠিন সমাজসত্যের বরাতে, দরিয়াবিবি এখানে ইতিহাসের বিশেষ সময়পর্বের একটি বৃহৎ সমাজের রূঢ় বাস্তবতার এক বিপন্ন প্রতিনিধি। শ্যামার মাতৃত্ব নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে শেষপর্যন্ত প্রাপ্তির আনন্দে পূর্ণ হয়, পুত্রবধূর মধ্যে নিজের মাতৃত্বের বহমানতাকে আবিষ্কারের মাধ্যমে নিজের পূর্ণতাকে অনুভব করে। অন্যদিকে দরিয়াবিবি মাতৃত্বের দায় মেটায় আত্মহননের মাধ্যমে; এক বিরূপ নিয়তি তাকে করুণ ট্র্যাজেডি ভোগে বাধ্য করে।

দরিয়াবিবি মানসিকতায় স্বাধীন ও দৃঢ়চেতা, যে-কোনো প্রতিকূল পরিবেশেও অনমনীয়, জননী হিসেবে সন্তানের মঙ্গলসাধনে নিরন্তর সংগ্রামশীল। সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ও প্রচণ্ডভাবে জেদি। কিন্তু সে নারী– পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নারী, উপনিবেশের পরাধীন নারী, ধর্মীয় সংস্কারব্যবস্থার নারী। এই নারী আবার জননী। সবগুলো ব্যবস্থাই তার জন্য বৈরী, সবকটি ব্যবস্থা একজোট হয়ে নিশ্ছিদ্র পাহারায় তাকে বন্দি করতে তৎপর। সে পুরুষতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতার শিকার, স্বামীর যখন-তখন গৃহত্যাগ তাকে বিপন্ন করে; তাকে গৃহেই থাকতে হয়, সন্তানদের মুখে খাবার জোগানোর দায়িত্বও পালন করতে হয়; অথচ বাড়ির বাইরের বৃহৎ জগৎ তার জন্য নিষিদ্ধ এলাকা। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর ধর্মীয় অনুশাসন তাকে নিঃস্ব করেছে, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মৃত স্বামীর ঘর ত্যাগ করেছে। এর ধারাবাহিকতায় মাতৃত্বের অধিকার থেকেও সে বঞ্চিত হয়েছে। তাই পুরুষতান্ত্রিক ধর্মশাসিত সমাজব্যবস্থার প্রতি সে অনাস্থা প্রকাশ করে: "দুনিয়ার দুঃখকষ্ট রোগবালাই সবকিছুর পিতিকার আমাদেরই করতে হবে।

আল্লা থাকে থাক্, না থাকে না থাক্। দু'তিন বছরে আমার ঈমান গেছে” (শওকত, ২০১০, পৃ. ২৪১)।

দরিয়ার দ্বিতীয় স্বামী আজহার তো মন্দলোক ছিল না, সবার কাছে সে সজ্জন হিসেবে পরিচিত, সংসারের প্রতি দায়িত্বশীল; দারিদ্র্য বিজয়ে তার চেষ্টা সীমাহীন, কিন্তু পরিণামে পরাভূত। আমরা আগেই বলেছি, আজহারের দারিদ্র্যের মূলে রয়েছে উপনিবেশি শোষণ। আজহারের ভাগ্যের সঙ্গে যেহেতু দরিয়াবিবি জোড়বাঁধা, তাই দরিয়াবিবির বিপন্ন বাস্তবতার জন্য উপনিবেশি ব্যবস্থাটিই দায়ী। দরিয়াবিবির করুণ পরিণতির জন্য উপনিবেশি ব্যবস্থাটি ভিন্নভাবে দায়ী এবং চূড়ান্তভাবে দায়ী। মুনাফানির্ভর উপনিবেশি নীতিবর্জিত ব্যবস্থার সুচতুর প্রতিনিধি ইয়াকুব। ইংরেজদের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দোসর হিসেবে বৈধ-অবৈধ নানান পন্থায় সে প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক হয়েছে। অর্থের প্রতি লোভের সমান্তরাল তার নারীদেহের প্রতি লোভ। দরিয়াবিবির চরম অসহায়ত্বে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে কৌশলে দরিয়াবিবির দেহটিকে ভোগের অধিকারে নিয়েছে। পুরুষতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্র দরিয়াবিবিকে দরিদ্র করেছে; কিন্তু ইয়াকুবের পুঁজিবাদের ধর্ষণে সে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে। তার চূড়ান্ত সর্বনাশ হয়েছে উপনিবেশি নীতিহীনতায়; কিন্তু এ-ব্যবস্থাটিকেও দরিয়াবিবি কষে পদাঘাত করেছে আত্মহননের মাধ্যমে। তার জননীসত্তা মৃত্যুতেও সমান অম্লান। যে-সন্তানের জন্মের কারণে অপবাদের দায় এড়াতে দরিয়াবিবি আত্মহত্যা করেছে, তাকে হত্যার মধ্য দিয়ে দরিয়াবিবি নিজেকে বাঁচাতে পারত। দরিয়াবিবি মাতৃ ও ধাত্রীর যৌথ ভূমিকা পালন করে সন্তানকে পৃথিবীর আলো-হাওয়ায় রেখে নিজে মৃত্যুর অন্ধকারকে বেছে নিয়েছে। এভাবে দরিয়াবিবি হয়ে ওঠে পৃথিবীর সকল অপব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে যুগপৎ এক অপরাজেয় নারী ও জননীসত্তা।

দরিয়াবিবির মৃত্যুর পরও উপনিবেশিত মানুষের জীবনকাহিনি এগিয়ে গিয়েছে। দরিয়াবিবির মৃত্যুতেও তার সন্তানরা আশ্রয়হীন হয়নি। নবজাত সন্তানটি আশ্রয় পায় মাতৃবুভুক্ষু হাসুবৌয়ের কোলে; অন্য সন্তানদের দায়িত্ব নেয় আমিরন চাচী। এতে এ সত্যটিই উন্মোচিত হয়, উপনিবেশের ঘায়ে এদেশের আপামর মানুষ বিপন্ন হয়েছে, কিন্তু তাদের যৌথমানবিক জীবনবোধকে চূড়ান্তভাবে বিপন্ন করতে পারেনি। আরও একটি কথা বলা দরকার, যে-ইয়াকুবের লাম্পট্যের কারণে দরিয়াবিবিকে চরম পরিণতি বরণ করতে হলো, সেই ইয়াকুবকে সে গভীর মমত্বে ক্ষমা করে দেয়:

> “দরিয়াবিবির কেমন মায়া হয়। হঠাৎ তার বুকে করুণা উথলিয়া ওঠে। নৌকায় সারা পথ আসিয়াছে, এক মাইল হাঁটিয়াছে, এখনও অভুক্ত। এখনও অভুক্ত! দরিয়াবিবি আর স্থির থাকিতে পারে! তার ইচ্ছা হইল: একবার ঘুম ভাঙাই সাগুটুকু খেয়ে নিক্। কিন্তু ডাকিতে গিয়া, থামিয়া গেল। কে যেন গলা টিপিয়া ধরিল অকস্মাৎ। দুঃখী মানুষ

দুয়ারে আশ্রয় লইয়াছে। সমস্ত ঘৃণা দরিয়াবিবির মন হইতে মুছিয়া যায়" (শওকত, ২০১০, পৃ. ৩১১)।

ইয়াকুব প্রতীকার্থে উপনিবেশের প্রতিনিধি। বাঙালি জাতিসত্তার মাতৃরূপ দরিয়াবিবি ইয়াকুবকে ক্ষমা করে দিয়ে কোটি কোটি বাঙালিকে শত বঞ্চনা-দেওয়া উপনিবেশক ইংরেজদের প্রতিই যেন ক্ষমা ঘোষণা করে দেয়। এই ক্ষমা কোনো অক্ষম জাতির দুর্বলতা নয়। বাঙালি জাতি চিরায়তভাবেই মানবিকবোধসম্পন্ন; শান্তির প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ বাঙালি কখনোই প্রতিশোধের স্পৃহা মনের মধ্যে চিরদিনের জন্য লালন করেনি।

দরিয়াবিবির প্রথম সন্তান মোনাদির নতুন স্বপ্ন নিয়ে নতুনভাবে পথ চলতে শুরু করে। এ পথচলা গ্রাম ও শহরে সমানভাবে বিস্তৃত: "মোনাদির রাজি হইয়াছে: শহরে তার কর্মস্থল, কিন্তু তার আবাসভূমি চিরদিনের জন্য মহেশডাঙায়" (শওকত, ২০১০, পৃ. ৩১৫)। এ-যেন স্বাধীন বাংলার নতুন যাত্রা। বাংলার প্রাণ চিরায়ত গ্রামগুলি আছে, থাকবে। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে যে শহরগুলি গড়ে ওঠেছে বাণিজ্য ও শিল্পের বিকাশের প্রয়োজনে, সেগুলিও এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা। এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে পেছনে ফেরা যাবে না। গ্রাম ও শহর– এই বাস্তবতাকে যুগলে আবদ্ধ করেই এগোতে হবে স্বাধীন বাংলাকে। এই ঐতিহাসিক আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেই উপন্যাসটির আখ্যান শেষ হয়েছে। এটিই স্বাধীন বাংলার উত্তর-প্রজন্মের সন্তানদের দরিয়া-জননীর প্রতি শ্রদ্ধাবনত প্রতিজ্ঞা।

১০.

শওকত ওসমানের *জননী* গ্রামীণ আবহের নিরীহ-দর্শন-উপন্যাস হলেও এর অন্তরালে চোরাস্রোতের মতো বয়ে গেছে ঔপনিবেশিক রাজনীতির ভয়াবহতা। গ্রামবাংলার বিত্তহীন মানুষের দারিদ্র্য ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঐতিহাসিক স্বরূপটি ঔপন্যাসিক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উপন্যাসের অবয়বে বুনে দিয়েছেন– উপন্যাসটির শিল্পসিদ্ধি ঐতিহাসিক সত্যের এই বুননের মধ্যেই নিহিত।

অন্ত্য-টীকা

১. সনৎকুমার সাহা: 'সত্যসন্ধ শিল্পসাধনা: সাহিত্যে শওকত ওসমান', (সিরাজুল, ২০১৭, পৃ. ৫০)।
২. সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছিল 'রোববার: ৭ : ২৯, ৮ বৈশাখ ১৩৯২: ২১ এপ্রিল ১৯৮৫'-এ।

সহায়কপঞ্জি

আকরম হোসেন, সৈয়দ। (২০১০)। *প্রসঙ্গ: বাংলা কথাসাহিত্য*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আজম, মোহাম্মদ। (২০১৫)। 'বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্ব'। *সাহিত্য পত্রিকা।* বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারি, বর্ষ: ৫২ সংখ্যা: ২।

কুদরাত-ই-হুদা। (২০১৬)। *শওকত ওসমান ও সত্যেন সেনের উপন্যাস আঙ্গিক বিচার*। আদর্শ, ঢাকা।

দেবেশ রায়। (১৯৯৪)। *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

দেবেশ রায়। (১৯৯৪)। *উপন্যাস নিয়ে*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

মনসুর মুসা। (২০০৮)। *পূর্ব-বাঙলার উপন্যাস*। অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৫)। *জননী* [সম্পা. রবিউল হোসেন]। ঝিনুক প্রকাশনী, ঢাকা।

রফিক, আহমদ [সম্পা.] (২০১৬)। *কথাশিল্পী শওকত ওসমান জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*। জয়তী, ঢাকা।

শওকত ওসমান (২০১০)। 'জননী'। *শওকত ওসমান উপন্যাস সমগ্র ১* [সম্পা. বুলবন ওসমান], সময় প্রকাশন, ঢাকা। পৃ্. ১১৯–৩১৬

সিরাজুল ইসলাম। (১৯৯৯)। *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী [সম্পা.] (২০১৭)। *শওকত ওসমান শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হায়দার আকবর খান রনো। (২০১৬)। 'প্রগতির পতকাবাহী রফিক'